অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কপালি থেকে গেল।

কপালির বাপ কালীপদ বলেছিল, বাবু ভালোমানুষ। থাক। মন টিকে গেলে থাকবি। মন খারাপ হলে বাবু চিঠি দেবে, তখন না হয় নিয়ে যাব। থেকে দ্যাখ। পেটভরে খেতে পাবি। জামাকাপড়ের অভাব রাখবে না। তা ছাড়া দেশের মানুষ। অচেনা নয়।

এর আগেও দেশের মানুষের বাড়িতে কপালি যে কাজ না করেছে তা নয়। তবে তার মন টেকে না। দুদিন যেতে না যেতেই বাড়ির জন্য মন খারাপ। বাড়ি বলতে খালপাড়-ভাইবোনগুলির জন্য মন পোড়ে। ভিটেমাটি বলতে কাঠা দু-এক জমি, সরকারের খাস থেকে পাওয়া। ছিল বিগেখানেক–কমতে কমতে কাঠা দু কাঠায় ঠেকেছে। খড়ের চাল, মাটির দেয়াল আর যেদিকে চোখ যায় বনজঙ্গল গাছপালা। খালের জল নদীতে গিয়ে পড়ে। নদী থেকে সমুদ্রে।

নদীর পাড়ে দৌড়ে গেলেই হুহু করে হাওয়া উঠে আসে। কপালি ফাঁক পেলেই দৌড়ে বনজঙ্গল পার হয়ে নদীর ধারে চলে যায়–ও-পার দেখা যায় না, নদীর ঢেউ, ভটভটির

শব্দ, নীল খোলামেলা আকাশের নীচে সন্ধ্যা তারা কিংবা দূরের বটগাছ, বটগাছের নীচে সাধুবাবার আশ্রম—মেলার সময় কী ভিড়, কী ভিড়!

তার মধ্যে আছে এক প্রকৃতির সুষমা।

বাপ কালীপদ এটা জানে, বোঝে। বনজঙ্গল পার হলেই নদী, ঘরের পাশে খাল, আদিগন্ত মাঠ সামনে—ফসলের দিনে সবুজ গন্ধে বাড়িটা ডুবে থাকে।

বৃষ্টির দিনে কাঠকুটো পাঁজাকোলে করে নিয়ে আসে। ভিজা কাঠে ধোঁয়া। বারান্দায় ভুখা ভাইবোনগুলির জন্য কপালি একদণ্ড বসে থাকে না। মা নেই—সে নামেই বাপ। বাপের কাজ তো কিছুই করতে পারে না। রায়মশায়দের বড়ো শরিকের ছোটোবাবুর পুত্র শহরে থাকে। বিদ্যার জাহাজ। তবে সংসারে শান্তি নেই। রোগভোগে বাবুর পরিবার জেরবার। সে দায়ে, অদায়ে ছোটোবাবুর কাছে যায়। তিনিই বলেছিলেন, বৌমা ছেলেপুলে নিয়ে পারে না। বিশ্বাসী লোকজনের খোঁজ পাসতো জানাবি।

বাবুতো জানে না, কপালি বড়ো হয়ে গেছে। বাবুতো জানে না, কপালি দু-দুবার শহরে কাজ করতে গিয়ে টিকতে পারেনি। একাই একবার চলে এসেছিল। রাস্তাখান তো সোজা না। শ্যামবাজার থেকে বাস। বাসে বারাসাত। আবার বাস। বাসে মহেশখালি। মহেশখালি থেকে ভটভটিতে পা কা দু-ঘণ্টা। তারপর ঘাট থেকে নেমে টানা এক ক্রোশ পথ। সকালে বের হলে গাঁয়ে পৌঁছাতে সাঁজ লেগে যায়। বড়োই দুর্গম অঞ্চল।

শাকপাতা, বন আলু, খালে বিলে মাছ আর নদী ধরে যায় হাঁড়ি পাতিলের নৌকা। কপালির নেশা—ওই হাঁড়ি পাতিলের নৌকা দেখা। ঘাটে যদি ভিড়ে যায়—টাকা পাঁচসিকেয় সে যা পারে কিনে আনে। শহরে টাকা ওড়ে কালীপদ জানে। সে নিজেও শহরে গিয়ে সুখ পায় না। কপালি চলে এলে কোনো ধন্দ থাকে না। বনজঙ্গলের নেশা। সহজে কাটবার নয়। বাবুরা বুঝিয়েও রাখতে পারেনি। সে কান্নাকাটি করলে রাখেই বা কী করে? দেশগাঁয়ের লোক পেলে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না।

তা কালীপদ বলেছিল, বিশ্বাসীজন তো ঘরেই আছে বাবু। সে কারো কাঠকুটোও সরায় না। তবে ওই এক বদভ্যাস বাবু।

কী বদভ্যাস! কে সে!

আমার কপালি। গতরে খাঁটি। মেয়েটা ঘর সামলায়। দু দু-বার শহরে পাঠালাম। মন টিকল না।

বদভ্যাসটি কী বললে না!

নেশা বাবু।

কীসের নেশা!

বনজঙ্গলের। নদীর পাড়ের। খোলা আকাশের।

নেশা বলছ কেন?

তা ছাড়া কী বাবু। ওইতো সেবারে কপালি শহর থেকে চলে এসে ভয়ে বাড়ি ঢোকেনি। পাছে মন্দ কথা বলি। বড়ো খাটতি পারে। বললাম, চলে এলি!

বাবুরা মন্দ স্বভাবে!

কী বলে!

কিছু বলে না।

ভালো নয়। কিছু না বললে চলবে কেন! শহর তো ভালো জায়গা নয়। কপালির মন্দ কিছু করেনি তো!

না বাবু। মন্দ কিছু করলে বলতনি! তার নাকি পেয়ারা গাছটা ছাগলে না হয় গোরুতে খাবে এই আতঙ্ক।

কপালি পেয়ারা গাছ লাগিয়েছে?

শুধু কী পেয়ারা গাছ! বাড়ি থাকলে, আনাচে-কানাচে নিজের মাটিটুকু সাফ করে লঙ্কা গাছ, কুমড়ো গাছ, ফুলের গাছ যা পায় লাগায়। গাছের যত্নআত্তি জানে। এটাও নেশা।

তা কপালির বদভ্যাস বলছিস কেন?

ওইতো বলছি বাবু, তার মন পুড়লে চলবে! পেট পুড়লে মন কি ঠিক থাকতে পারে! আগে তো পেট বাবু, পরে তো মন—কী বলেন, ঠিক বলিনি!

সবই ঠিক। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারিস। হোকন অফিস যাবে না বৌ সামলাবে, বাচ্চা সামলাবে বুঝতে পারছি না। ঠিকা কাজের লোক আছে। তার মাকে ফের চিঠিতে লিখছে, দেশ থেকে যদি কেউ যায়।

চেনাশোনা ছাড়া বাড়িতে কাউকে রাখাও যায় না। দিনকাল বড়ো খারাপ। ঝি চাকর গলায় ছুরি বসায়—খবরের কাগজ দেখে তো ঘিলু ঠাণ্ডা মেরে যায়। কাকে যে পাঠাই।

কপালিরে দিয়ে আসব বাবু?

থাকবে?

সেই। থাকবে কি না কথা দিতে পারব না। কন্যে লকলক করে বাড়ছে বাবু। কুমড়ো গাছের মতো—এ-বেলা দেখলেন একরকম, ও-বেলা অন্যরকম। আমার কপালি কাজ করলে ক-টা কাচা পয়সা হয়। তা কন্যে মাথা পাতছে না। শহরের কথা তুললেই মন খারাপ, মেজাজ খারাপ-খাঁচার মধ্যে বন্দি। আমি কী টিয়া না ময়না। খাঁচায় পুরে দিয়ে আসতে চাও!

কথা তো মিছে না। কপালির দোষ নেই। তবে খোকন বেশ বড়ো জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছে। আমি জমিটা কিনে রেখেছিলাম—কোনো রকমে বাড়িটা করেছি। তোর গিন্নিমা গিয়েও সুখ পায় না।

কলকাতায় আমারও মন টেকে না। কেন টেকে না বলতো?

সেইতো কথা বাবু। কপালির দোষ দিই না। আমার ভাগ্য। বাপের স্বভাব পেয়েছে। শহরে যেতে পারলাম কৈ বাবু? কেত্তনের গলাখানা আমারে খেয়েছে। তা খোলে চাপড় মেরে যখন গাই, ও রাই নিশি যে পোহায়—শহরে কে বোঝে তার মর্ম বলেন।

নিশি যে পোহায়।

খুবই দামি কথা। ছোটোবাবু ঝিম মেরে থাকেন। কথা বলেন না। শুধু মাথা ঝাঁকান—নিশি যে পোহায়।

তা কপালিরতো নিশি পোহাবার সময় নয়। নিশি সবে শুরু। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী। ওরে একদিন নিয়ে আয়, দেখি।

কালীপদ এক ক্রোশ হেঁটে কপালিকে দেখাতে নিয়ে গেছিল। বাবুর সম্ভ্রম আছে এ-তল্লাটে। লোকে এক নামে গড় হয়।

সেও কপালিকে গড় হতে বলেছিল।

দিব্যি কোঠাবাড়ি—সামনে গন্ধরাজ ফুলের বাহার। কপালি এক ফাঁকে কখন যে গাছের কাছে চলে গেছে। ফুল তুলছে। খোপায় গুঁজেছে। তারপর বাবুর পায়ে গড় হলেই বলেছেন, কপালি তুই ফুল হয়ে ফুটে থাকতে চাস ভালো। টিয়াপাখির মতো উড়ে বেড়াতে চাস ভালো—বয়েসটাতো ভালো না। তা কালীপদ শাড়ি কিনে দিও। বলে দুখানা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ঘুরে দেখে আসতে পারিস। মন টিকলে থাকবি, না টিকলে কী করা! বাচ্চাদুটোকে দেখাশোনা করবি, পারবি না!

কপালি একবার বাপের দিকে তাকায় অন্য বার বাবুর দিকে তাকায়। কিছু বলে না। যা বলবে বাবা, যা করবে বাবু। সে তো সব বুঝতে পারে না।

তা কালীপদ নিয়ে যাও। মেরে তোমার মাথা পাতবে মনে হয়। খাঁচায় বন্দি থাকবে না। বাড়িটায় ঝোপজঙ্গলও গজিয়েছে। বর্ষাকাল বোঝইতো। সাফ না করলে ঘাস, ঝোপজঙ্গলে ভরে যায়। বনজঙ্গলেরতো নিশি পোহাবার বালাই নেই। আপনিই বড়ো হয়, আর আপনিতেই মজে যায়। শীত এলে বুঝি। ফাগুনের বাতাসেই পাতা ঝরতে থাকে। কীরে কপালি বুঝলি কিছু?

ফিক করে হেসে দিয়েছিল কপালি। বাপের পেছনে গিয়ে মুখ লুকিয়েছিল। কোনো কথা বলেনি।

দুদিন পরে ফের গিয়েছিল কালীপদ। গড় হয়েছিল।

কী খবর।

মেয়েতো মাথা পেতেছে বাবু।

বলিস কী?

ওই যে বলেছেন, ঝোপজঙ্গল আছে—কী বুঝল কে জানে—বলল, কবে যাব বাবা। তুমি দিয়ে এস।

তারপর টাকাপয়সার রফা। কপালি টাকাপয়সার মধ্যে থাকে না। টাকাপয়সা সে বোঝেও না। ভাই-বোনগুলি খেতে পাবে—উদোম হয়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করবে না-দিদি যাবে শহরে—তা পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে—কবে আসে দিদি—এলেই দৌড়। দিদির কোমর জড়িয়ে চিৎকার—আমার দিদি। দিদি এসেছে।

কপালির এই সুখটাও কম না। এই ভাবনাটাও বড়ো মধুর।

তা কপালিকে নিয়ে রওনা হবার সময় কালীপদ বার বার বুঝিয়েছে, ভেবে দ্যাখ, আমার মুখ পোড়াস না। বাড়িঘর দেখে পছন্দ হলে থাকবি, নয়তো সঙ্গে নিয়ে ফিরে আনব। বাবু নতুন শাড়ি দিয়েছে। শাড়ি পরতে শিখে গেলি। বেইমানি করলে, মুখ থাকবে না।

সে শহরে ঢুকে দেখল, তারাবাতির মতো রাস্তায় আলো জ্বলছে। লোকজন, হট্টগোল পার হয়ে ঠিকানা খুঁজে বাড়িখানা বের করতেই হিমসিম খেয়ে গেল।

নতুন বাড়িঘর উঠছে। এদিক ওদিক ফাঁকা জমিরও অভাব নেই। গাছপালাও চোখে পড়ছে। ডোবা কচুরিপানায় ভরতি, ইট সুরকির রাস্তা—তারের লাইন চলে গেছে মাথার উপর দিয়ে। গাঁয়ের আসটে গন্ধটা যে মরে যায়নি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই কপালি টের পেল।

গেট সামনে।

ঝুঁকে, কী লেখা দেখল কালীপদ। নিকু' ভবন। ছোটোবাবুর নামে বাড়ির নাম। সান বাঁধানো রাস্তা গেট থেকে। কালীপদ গেট খুলতেই ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছিল!

কে? কে?

আমি খোকনবাবু। আপনার বাবা পাঠিয়েছে।

দরজা খুলে বলেছিল, ভিতরে এস। তারপর খোকনবাবু পত্রখানা পাঠ করে বলেছিল, তোমার মেয়ে।

আজ্ঞে বাবু।

খোকনবাবুর স্ত্রীও হাজির।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বাবা পাঠিয়েছে।

স্ত্রীটি যে কমজোরি দেখে টের পেয়েছে কালীপদ। কপালি গা ঢেকে একপাশে অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

চিঠির বয়ানটি খুব মধুর ঠেকেনি। বাবা লিখেছেন, সুজাপুরের লোক এরা। বাবা কীর্তন গাইয়ে। মেয়ে ফুল-বিলাসী। দ্যাখো রেখে, যদি টিকে যায় ভালো। না টিকলে চিঠি দেবে—কালীপদ গিয়ে নিয়ে আসবে।

কীরে থাকতে পারবিতো?

ঘাড় বাকিয়ে দিয়েছিল কপালি।

কালীপদ দুগগা নাম জপ করছে। বললেই হল, আমি যাব বাবা।

কোথায় যাবি।

তোমার সঙ্গে চলে যাব।

যাক ঘাড় কাত করেছে। থাকতে পারবে বলছে। তবু সারারাত কালীপদ ঘুমোতে পারেনি। খাওয়াটাও পেটের কসি আলগা করে—মুগের ডাল, বেগুনভাজা, ইলিশ মাছের ঝাল, চাটনি। শেষ পাতে গিন্নিমা দুটো মিষ্টি দিয়েছে। বাচ্চা-দুটি যে জমজ বুঝতে অসুবিধা হয়নি। দেখতে একরকম। একটা গেলে, আর একটাকে খুঁজে আনলেও চলে।

সকালে উঠে কালীপদ কপালিকে বিছানায় দেখতে পায়নি। বাইরের ঘরে তাদের থাকতে দিয়েছে। ফুল ফল আঁকা রংচঙে মেজে। মাদুর দুখানা, বালিশ দুখানা। বড়ো বড়ো জানালা খোলা। বাবু পাখা চালিয়ে দিলে বলেছিল, না বাবু, পাখার হাওয়া সহ্য হয় না। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। মাথা ধরে।

তা এই গরমে!

গরমকালে, গরম থাকবে না! সে হয় বাবু!

বৃষ্টি বাদলার দিনে বৃষ্টি না হলে গরমের প্রকোপ বাড়ে। ভ্যাপসা গরম পড়েছে। তবু কালীপদ পাখা চালাতে রাজি হয়নি।

কপালিও বেঘোরে ঘুমিয়েছে।

সকালে উঠেই দেখেছে, কপালি বিছানায় নেই। গেল কোথায়। তা তার একটু বেলা হয়ে গেছে, উঠতে।

আকাশ ফর্সা। রোদ উঠে গেছে। এত বেলা অবধি কপালি বিছানায় থাকতে পারে না। অন্ধকার থাকতেই কপালির ঘুম ভেঙে যায়। তার হাঁস মুরগি আছে। মুরগির ডিম হয়। কপালি ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বানায়। বড়ো করে। সংসারে শতেক কাজ।

সে দেখল দরজা খোলা।

সদরও খোলা।

বাবুরা কেউ ওঠেনি। বাবুদের বেলা করে ঘুম ভাঙে। কিন্তু কপালি গেল কোথায়।

সদর ধরে বাইরে বের হয়ে এল। ভিতরের দিকের দরজা বন্ধ। কপালি কি হাওয়া হয়ে গেল। তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। আর তখনই দেখল বাড়িটা মেলা জায়গা জুড়ে। অথচ গাছপালা কিছু নেই। ফাঁকা জমিন—ঘাস বড়ো বড়ো। চারপাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গেটে তালা মারা। পাঁচিল টপকে কপালি পালাতে পারবে বলে মনে হয় না। সে আর্ত গলায় ডেকেই উঠত, বাবুগো আমার সর্বনাস হয়েছে।

কিন্তু তখনই দেখল, পাঁচিলের এক কোণায় কপালি ঝোপজঙ্গলে উঁকি দিয়ে আছে।

অ কপালি! তুই এখানে। তোরে খুঁজছি।

বাবা দেখবে এস।

কালীপদ ছুটে গিয়েছিল।

কলমি লতায় ফুল এয়েছে। কপালি ফুল দেখে কী খুশি!

পাঁচিলের কোণের দিকে সামান্য জলা জায়গা। শাড়ি তুলে কপালি কলমিলতার শাক তুলছে।

বাবু বের হয়ে বলছেন, আরে তোমরা এখানে?

কপালি কেমন লজ্জা পেল। সে পা ঢেকে সরে দাঁড়াল।

কপালির কাণ্ড দ্যাখেন বাবু! শাকপাতা তুলছে। আর কপালির এই দোষ, একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে জানে না। ঘুম থেকে উঠে দেখি বিছানায় নেই। বিদেশ জায়গা—ডর লাগে না বলেন! তা জায়গা তো অনেক। গাছ নাই একটা বাবু। কপালির ওই আর এক দোষ। ফাঁকা জমিন সহ্য হয় না। ওর দোষগুণ ক্ষমা করে নিলে, কপালি আমার সন্ধ্যাতারা।

তা সন্ধ্যাতারাই বটে।

কপালি কই রে!

যাই দাদাবাবু।

কলপাড়ে কী করছিস! ডাকলে সাড়া দিস না। বৌদিমণির ঘরে চা দিলি না।

কপালি দৌড়ায়।

কলপাড়টা কী হয়ে আছে! বর্ষাকাল-ঝুপঝাপ বৃষ্টি নামে। ঝম ঝম করে আকাশ মেঘলা হয়ে যায়—ঘোর অন্ধকারে কপালি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর কেন যে তার মনে হয়, জমি পরিষ্কার করে দুটো কুমড়োর চারা পুঁতে দিলে হয়। তার চোখ, বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরে। সে দেখেছে এটো কাঁটা ফেলার জায়গায়, দুটো কুমড়োর চারা বর্ষার জলে লক লক করছে। সে ফাঁক খুঁজছিল— দাদাবাবু অফিস, অরুণ বরুণ মার সঙ্গে দিবানিদ্রা দিচ্ছে।

এই সুযোগ।

সে চুপি চুপি খুরপি হাতে বের হয়ে এসেছে। দাদাবাবু এত সকাল সকাল বাড়ি আসবেন বুঝতে পারেনি। সদরে ঢুকে গেলে কলপাড় থেকে বোঝায় উপায় থাকে না। সে কলপাড়ে কী করছে ভাবতেই পারে। জিভ কেটে সে দৌড়াল। বৌদিমণি দরজা খুলে দিয়েছে। খুবই অনায্য কাজ। সে আঁচলে হাত মুছে এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে বাসন সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দাদাবাবু বুঝুক, সে রান্নাঘরেই আছে।

বৌদিমণি বুঝুক, সে চা-এর জল গরম করছে।

দাদাবাবু রান্নাঘরে উঁকি দিতেই বলল, চা করে দিয়ে আসছি দাদাবাবু।

কোথায় থাকিস। কলপাড়ে গলা পেলাম। না, ঘরেই ছিলাম।

সে না ধরা পড়ে যায়। নতুন জায়গা, তবে সে বোঝে, বৌদিমণি বড়ো আয়েসি। সে খুবই কাজের। কারণ শহরে যে টাইমে জল আসে তাও সে জানে। গ্যাস বন্ধ করতে জানে, খুলতে জানে। বৌদিমণি খুবই অবাক–তুই এত শিখলি কবে?

বৌদিমণি, তোমাদের টাইমের জল নেই।

আসবে। কেন!

শহরে তো টাইমের জল থাকে।

আসলে বৌদিমণি টের পাক, সে শহরের অনেক খবরই রাখে। টাইমে জল আসে তারও খবর জানা। বৌদিমণিকে অবাক করে দিতে পারলে ভারি মজা। কুমড়োর চারা পুঁতে দিয়েছে। মাটিতে লেগে গেলেই ডগা মেলতে শুরু করবে। এটা তার আর এক আনন্দ।

সে বাজার করেও আনে।

লোকজনের সঙ্গে মিশতে শিখে গেছে।

ও মাসি, আমাকে দুটো লঙ্কার চারা দেবে।

কী করবি।

যারে কত জমি আমাদের। গাছ হলে লঙ্কা হয় তাও বুঝি জান না?

গাছ হলে লঙ্কা হয় খবরটা কপালি ছাড়া কেউ যেন বোঝে না।

দাদাবাবুর এক অভিযোগ, তুই ঘরে থাকতেই চাস না। থাকবে কি! খোলামেলা আকাশ যে তার প্রিয়। ঘরের মধ্যে কাহাতক বন্দি হয়ে থাকা যায়। বাড়ির ফাঁকা জায়গাটুকু না থাকলে তার যে কী হত।

এই কপালি।

আজ্ঞে যাই বৌদিমণি।

এত বেলা হল, চান করিসনি, খাসনি! কী করছিস?

রিনা দরজায় চুপি দিলে দেখতে পায়-কপালি কি লাগাচ্ছে।

কী আবার কার কাছ থেকে আনলি! তোর কি মাথা খারাপ আছে!

এই হয়ে গেল। যাচ্ছি।

ক-টা বাজে খেয়াল করেছিস?

তা অনেক বেলা। তারতো জমির আগাছা দেখতে ভালো লাগে না। সে যে নিজের মেলা জমি পেয়ে গেছে তারতো মনেই হয় না, সে এ-বাড়ির কেউ না। কুমড়ো গাছ, লঙ্কা গাছ,

ক-টা বেগুনের চারা পর্যন্ত পুঁতে দিয়েছে। কে যে মাথার দিব্যি দিয়েছে সে তাও জানে না, তবে দাদাবাবু একদিন খুবই প্রশংসা করেছে। তার হাতের গুণ আছে। কুমড়ো ফুল

ভাজা খেতে খেতে দাদাবাবু এমন বলেছিল। তারপর বড়ো বড়ো কুমড়ো ধরল, গাছে লঙ্কা হল—দাদাবাবু দেখে আর অবাক হয়ে যায়।

সে কোত্থেকে দোপাটি ফুলের চারা এনেছে। কিছু রজনীগন্ধার মূল। এবং এক বছরেই সে বাড়িটায় পেঁপে গাছ, লেবুর গাছ এবং সঙ্গে দুটো আমগাছের চারা পর্যন্ত পুঁতে দিয়েছে। এত ফাঁকা জমিন—শুধু আগাছা থাকবে, হয়!

হঠাৎ বিকালে সেই কপালি উধাও। গেল কোথায়! না বলেতো কোথাও যায় না। বড় রাস্তা, বাজার ওদিকে, হানাপাড়া পর্যন্ত চেনে—তার বেশি না।

রিনা, কপালি নেই!

রিনা টেবিল পরিষ্কার করছিল।

কিছু বললে?

কপালিকে কোথাও পাঠিয়েছ?

নাতো! দুধ আনতে যায়নি তো। দ্যাখোতো রান্নাঘরে দুধের পাত্র আছে কি না?

দাদাবাবুর মাথা গরম। কপালির গায়ে কি শহরের জল লেগে গেল! সে যদি পালায়। তা কপালির মিষ্টি মুখখানি উঠতি ছোকরাদের টানতেই পারে। সকাল থেকে তো কাজের শেষ থাকে না।

এই কপালি যা, দোকান থেকে দাদাবাবুর ব্লেড নিয়ে আয়।

এই কপালি যা, রেশন তুলে আনগে।

এই কপালি যা, গ্যাসের লোকটাকে খবর দিয়ে আয় সিলিণ্ডার খালি।

কত লোককে সে এখন চেনে।

তুই কাদের বাড়িতে কাজ করিস রেবললেই কপালি ক্ষেপে যায়।

আমি কোথায় কাজ করি তা দিয়ে তোমার কী দরকার?

সে বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে একবার একটা কাগজি লেবুর কলম কিনে এনেছিল। লোকটা তাকে চেনে। খোকনবাবুর কাজের মেয়ে। কাজের মেয়ে কাগজি লেবুর কলম দিয়ে কী করবে! মনে তার সংশয় হতেই পারে।

কোথায় লাগাবি!

কেন আমাদের বাড়িতে।

লোকটা হেসেছিল।

কপালির যে তখন কী রাগ হয় না। সে গজ গজ করছিল, আমার গাছ কোথায় লাগাব তাতে তোমার কি গো। জায়গা না থাকলে গাছ কেউ কেনে! গাছ না থাকলে বাড়ি হয়!

জানো দাদাবাবু লোকটা ভালো না।

কোন লোকটা!

ওই যে গাছের চারা নিয়ে বসে থাকে।

আবার গাছ কিনলি!

এই এতটুকুন গাছ। বেশি দাম না।

দাদাবাবু কিছু আর আজকাল বলেন না। বাড়িটাকে কপালি খুশিমতো বাগান বানিয়ে ফেলছে। আত্মীয় স্বজনরা এলে সে তার কিচেন গার্ডেন ঘুরিয়ে দেখায়। এতদিন বাড়ির পেছনের দিকটা ঝোপ–জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে থাকত। এখন সেখানে একটা আগাছা গজাতে দেয় না কপালি। কপালির গাছ লাগার এত নেশা যে চান খাওয়ার কথাও মনে রাখতে পারে না। আবদার করলে সে নিজেও গাছের কলম কেনার জন্য আলাদা পয়সা দেয়। কপালিকে আর মনেই হয় না, সে এ-বাড়ির কেউ না। শহরে থেকে রং ফর্সা হয়ে গেছে। রিনাও পছন্দ করে, বকাঝকাও করে। পূজার সময় কপালির পছন্দ মতো সায়া শাড়ি কিনে দিয়েছে। নিজের শাড়ি একটু পুরোনো হলেই কপালিকে দিয়ে দেয়। কী খুশি মেয়েটা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে ঘুরে ফিরে দেখতেও পছন্দ করে। গোপনে কাজটা সারে। একদিন তার চোখে পড়ে যেতেই বুকের কাছে মাথা নীচু করে হাওয়া।

কিন্তু গেল কোথায়?

কার কাছেই বা খবর নেবে! উঠতি বয়েস। ফুলের মতো ফুটে উঠছিল সবে। কী যে করে!

কপালি অদায়িত্বশীলও নয়। যদি কোনো উটকো লোকের পাল্লায় পড়ে যায়।

সাজ লেগে গেল। সামনে কপালির ফুলের বাগান। টগর দোপাটি যুঁই মালতী কী ফুল নেই। সদর দরজায় রিনা দাঁড়িয়ে।

দুশ্চিন্তায় মুখ ভার। মেয়েটা শেষে না বলে-কয়ে পালাল!

রিনা দেখল তার মানুষটি ফিরে আসছে। একা।

কোনো খোঁজ পেলে! কেউ দেখেছে।

না। কেউ দেখেনি।

তবু একবার ভালো করে ঘরগুলি দেখা দরকার। বাড়িতে ঘরও অনেক। বাবার ইচ্ছে ছিল ফ্ল্যাট বাড়ি করার। দুটো করে হাজার স্কোয়ার ফিটের মতো ফ্ল্যাট। তার বাবা শেষে কেন যে মত বদলালেন। বাড়িতে থাকবে তো নিজের বাড়িতে থাকবে। বাইরের লোক বাড়িতে থাকা ঠিক না। ফ্ল্যাট বাড়িগুলি নিরাপদ নয়। কার বাড়িতে কোন অছিলায় কী লোক ঢুকে যাবে—কিছু বলাও যাবে না। পরে আর বাড়ির কাজে বাবা হাতই দিলেন না। দেশের জমিজমা বেচে দিয়ে শহরে চলে আসবেন এমনও ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না।

তোমার মা থাকতে রাজি না। বাবার এক কথা।

তোমার বাবাও শহরে এসে সুখ পায় না। বাবার এক কথা।

আসলে গাঁয়ে থাকলে এক রকমের স্বভাব, শহরে থাকলে এক রকমের।

ওদিকের ঘরগুলি খোলাও থাকে। বন্ধও থাকে। লম্বা করিডোর—দু-পাশে দুটো ফ্ল্যাট–এখন সবটাই তার ভোগ দখলে।

কোনো ঘরে যদি ঘাপটি মেরে থাকে। আকাম কুকাম করলে বুঝতে পারে কপালি, দাদা এসে চোটপাট করবে। দাদাবাবু বকতে পারে। তখন পালিয়ে থাকার স্বভাব। অন্ধকারও পছন্দ। শ্যামলা রং ধরেছে ইদানীং। বিয়ের বয়স ফুটে উঠলে যা হয়। লাবণ্য যেন উপচে পড়ছে। কারো নজর পড়বে না হয়! আর কপালি যদি মাথা পাতে।

দরজা খুলে সব ঘরগুলিই দেখা গেল।

ঘুমালে অঘোরে ঘুমায় কপালি। দিশা থাকে না। সাঁজ লাগলেও সাড়া পাওয়া যায় না। মরার মতো ঘুম। মাদুর পেতে শুতে তর সয় না। পড়লো তো মরল।

না কোনো ঘরে নেই। ছাদেও নেই। বাথরুম খুলে দেখল। তারপর অগত্যা দেশেই খবর পাঠাতে হয়। থানা পুলিশ করতেও ভয়। কালীপদকে আগে খবর দেওয়া দরকার। সঙ্গে

বাবাকেও। বাবা ঠিক কথাই বলেছেন, মন খারাপ হলে পালাতে পারে। যদি দেশেই চলে যায়।

সাত পাঁচ ভাবছিল তারা। আর তখনই রিনা বলল, দেখতো গেটের অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

গেট বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল সে। বেশি রাতে গেট খোলা রাখতেও সাহস পায় না।

কে? ওখানে কে?

সাড়া নেই।

সে ছুটে গিয়ে দেখল, অন্ধকারে কপালি দাঁড়িয়ে আছে।

আর মাথা ঠিক রাখা যায়?

কোথায় গেছিলে! ভিতরে আয়। আজ তোর একদিন কী আমার একদিন!

কপালি মাথা তুলছিল না। দাদাবাবু চোটপাট করলে সে এমনিতেই ঘাবড়ে যায়। আজ যে কপালে দুর্ভোগ আছে ফেরার মুখেই টের পেয়েছিল।

দাদাবাবু, বৌদিমণি কাউকে না বলে বের হয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। মিনসেটা এত পাজি জানবে কী করে।

কী বললি কপালি?

আমার গন্ধরাজ ফুলের কলম কী হল?

দেব!

তবে দিচ্ছ না কেন। ঘোরাচ্ছ। বা

ড়িতে কলম করেছি। হলে বলব।

কবে হবে?

সময় হলে বলব। তখন কিন্তু না করতে পারবি না।

বারে না করব কেন?

বাড়ি যেতে হবে। যা

ব। বাড়ি কতদূর!

এই হানাপাড়া পার হয়ে।

গেট বন্ধ করার সময় দাদাবাবু তার দিকে তাকিয়ে অবাক!

এঁকি ছিরি তোর। চোখ বসে গেছে কেন! এত আতঙ্ক কীসের। হাতে ওটা কী! শাড়ি সায়া ব্লাউজ সামলাতে পারেনি। দেখেই দাদাবাবু বোধহয় টের পেয়ে গেছে। সে ফুঁপিয়ে উঠল। কাঁদছে।

কী হল!

রিনাও ছুটে এসেছে। গেটে এই তামাসা তার পছন্দ না। বলা নেই কওয়া নেই হাওয়া। রাত করে ফিরে আসা! চোখে আবার জল গড়াচ্ছে! ঢং। হাতে ছোট্ট টব। কী ফুল, কী গাছের কলম কিছুই বুঝছে না রিনা। সব গেলেও কপালি টবটা আর গাছটা অক্ষত রাখতে পেরেছে–একেবারে ভেঙে পড়ছে না। এতে আরও ক্ষেপে গেল রিনা।

ভিতরে যা।

কপালি বাড়ি ঢুকে বারান্দায় টবটা আলতোভাবে নামিয়ে রাখল।

তারপর জেরা শুরু।

জেরার মুখে কপালি বলল, আমার কী দোষ, লোকটা তো বলল, বাড়িতে গেলে দেবে!

কোন লোকটা!

ওই যে গাছফাছ বিক্রি করে।

ধন'য়। ও বলল, আর তার বাড়ি গেলি!

আমার কী দোষ! ওতো ঘোরাচ্ছিল। বাড়ি যেতে বলল। লোকটার খারাপ মতলব বুঝব কী করে? টবটা দেখিয়ে বলল, ঘরে আয়। দামদর হবে! কত এনেছিস! বলেই হাত ধরে টানতে থাকল। আমিও ছাড়িনি। হাত কামড়ে টব নিয়ে পালিয়েছি।

টবটা ছুঁড়ে মারতে পারলি না মুখে! দেখাচ্ছি মজা!

টবটা ছুঁড়ে মারলে ভেঙে যেত না! গাছটা কী তবে বাঁচত!

বৌদিমণি কিংবা দাদাবাবু কেন যে আর একটা কথা বলতে পারল না। মাথা নীচু করে ভিতরের দিকে চলে গেল! নিজে ক্ষতবিক্ষত হলেও গাছটা অক্ষত আছে ভেবেই কপালি খুশি।

কপালি বেশ চেঁচিয়ে বলল, বৌদিমণি গাছটা কিন্তু গেটের সামনে লাগাব।

দেখবে ফুল ফুটলে বাড়িটা গন্ধে ম ম করবে। কী মজা হবে না বৌদিমণি।

কপালি সব ভুলে গেছে। টবটা কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছে না।

ও বৌদিমণি, টবটা বারান্দায় রাখলাম।

অবশ্য ভিতর থেকে কোনো সাড়া নেই।

সে আবার চেঁচিয়ে বলল, গাছ না হলে বাড়ি হয়।

এবারেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

কপালি সত্যি সন্ধ্যাতারা। তারার সঙ্গে কে কথা বলে!